একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Santali Festival 'Saharay' in the Society and Literature

সমাজ ও সাহিত্যে সাঁওতালি মহোৎসব ‘সহরায়’

Name of the Author: **Shibram Hansda**

Affiliation: **Research Scholar, Bengali Department,**
Burdwan University, West Bengal, India

Abstract: This article discusses the significance of the Sohrai festival in Santali society and its representation in Bengali–Santali literature. Referring to Nalini Bera’s novel Tiriyo Arabanashi, it explains the popular Santali proverb “Hati Lekan Sohrai,” which compares the festival’s grandeur and duration to the size of an elephant. The study begins with an overview of the Santals—their origin, language (Santali), and script (Ol Chiki), as well as their close relationship with nature. It highlights the cultural importance of Sohrai as the largest communal festival celebrated for five days. Each day of the festival—Um Maha, Bonga Maha, Khuntaw Maha, Khunta Tot, and Jale Maha—is associated with specific rituals, worship, and social activities. The festival includes the worship of deities and cattle, collective feasting, dance, music, and community bonding. Literary references from Nalini Bera and Mahasweta Devi illustrate the emotional and cultural depth of Sohrai in Santali life. The article also reflects on the social values, unity, and cultural identity expressed through the festival. Finally, it emphasizes the need to preserve Santali traditions while maintaining social awareness and dignity in modern society.

Keywords: Sohrai Festival, Baha Festival, Santali Culture; Santal Community, Nalini Bera, Mahashweta Devi, Tiriyo Arbnashi, Shalgirar dake, Santali Literature, Ol Chiki Script, Indigenous Traditions, Folk Songs, Cultural Identity.

সমাজ ও সাহিত্যে সাঁওতালি মহোৎসব ‘সহরায়’

শিবরাম হাঁসদা

বিশিষ্ট বাংলা কথাসাহিত্যিক নলিনী বেরা তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘তিরিয়ো আড়বাঁশি’-তে সাঁওতালদের জাতীয় মহোৎসব ‘সহরায়’ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ‘হাতি লেকান সহরায়’ এই বিশেষ সাঁওতালি জনপ্রিয় প্রবাদটির উল্লেখ করেছেন। ‘হাতি লেকান সহরায়’[১] কথার অর্থ হাতির মতো সহরায় অর্থাৎ হাতি যেমন বিশালাকার হয়ে থাকে সহরায় পরবও একটানা পাঁচ দিন ধরে উদযাপিত হয়। সাঁওতালদের সহরায় পরবই এমন পরব যা দীর্ঘদিন যাবৎ উদযাপন করা হয়। তাই এই পরবকে হাতির সাথে তুলনা করা হয়। আমরা সাঁওতাল সমাজ ও বাংলা-সাঁওতালি কথাসাহিত্যে এই মহোৎসবকে নিয়ে চর্চার প্রসঙ্গে আলোকপাত করার পূর্বে সাঁওতালদের পরিচয় ও সাঁওতাল সমাজ- সংস্কৃতি সম্পর্কে যথাসম্ভব আলোচনা করব।

ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, আসাম সহ একাধিক রাজ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বসবাস লক্ষ করা যায়। এদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হল সাঁওতাল জনজাতি। প্রাক আর্য যুগ থেকেই এরা ভারতবর্ষের ভূখণ্ডে বসবাস করছে। নৃতত্ত্ববিদরা জানিয়েছেন সাঁওতালরা প্রোটো-অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি আছে। এরা জোটবদ্ধভাবে বসবাস করে। তাদের মধ্যে এক বিশেষ ধরণের জাতিসত্তা বা আত্মিক টান লক্ষ করা যায়। সাঁওতালি লোককথা অনুসারে সাঁওতালরা হিহিড়ি পিপিড়ি নামক স্থান থেকে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে খাদ্য, বাসস্থানের সন্ধানে বা বহিরাগত দিকুদের অত্যাচারে তাদের বারেবারে বাসস্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সাঁওতালরা শুধুমাত্র ভারতেই নয়, ভারতের বাইরে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপালেও বসবাস করে। সাঁওতালদের ভাষার নাম ‘সাঁওতালি’ এবং পণ্ডিত রঘুনাথ মুরমু কর্তৃক আবিষ্কৃত এই ভাষার লিপির নাম ‘অলচিকি’। অনেক সময় দেখা যায়, জেনে হোক বা না জেনে অনেকেই সাঁওতালি ভাষা ও অলচিকি লিপির নামের বিভ্রাট সৃষ্টি করেন। তাই মনে রাখার বিষয় ভাষার নাম সাঁওতালি ও লিপির নাম অলচিকি। সাঁওতালদের শারীরিক গঠন বর্ণনা করতে গিয়ে নলিনী বেরা তাঁর ‘তিরিয়ো আড়বাঁশি’ উপন্যাসে মঙলু চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন-

“মোষের মতোই গায়ের রং। কোঁকড়ানো কালো চুল। সাদায় কালোই বড় বড় চোখ দুটো। আড়বাঁশিতে ফুঁ দিলে তার মোষটাও বাঁশির সুরে শিং নাড়ে। তালে তালে হাঁটে।”[২]

এই বর্ণনা থেকে আদিবাসী সাঁওতালদের শারীরিক গঠন এবং তাদের জীবজন্তু ও প্রকৃতি প্রেম সম্পর্কে জানতে পারি।

সাঁওতালরা হল প্রকৃতিপ্রেমিক ও প্রকৃতির পূজারী। শাল গাছ হল সাঁওতালদের জাতীয় বৃক্ষ। সাঁওতালরা শালবনের ধারে বসবাস করে অথবা গ্রামে শালগাছ রোপণ করে থাকে। বসন্তে প্রকৃতি যখন সবুজ পাতা ও ফুলে ফুলে সেজে ওঠে সেই আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে এরাও প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে ওঠে। সাঁওতাল রমণীরা চুলের খোঁপায় শালফুল, পাঞ্চি শাড়ি পরিধান করে, পুরুষেরা মাথার পাগড়িতে অথবা কানে শাল ফুল গুঁজে বাহা পরব উদযাপনে মেতে ওঠে। সাঁওতালরা যেহেতু প্রকৃতিকে দেবতা বলে পুজো করে তাই তাদের সমস্ত পরবই প্রকৃতি আর প্রকৃতির সৃষ্টিকেন্দ্রিক। বাহা, জানথাড়, এরোঃ, মাঘ সিম এই পরব গুলোর চেয়েও বৃহৎ আকারে পালিত হয় সহরায় পরব। বাংলায় এই পরবটি বাঁদনা পরব বলেও পরিচিত। ‘বাঁদনা’ শব্দটি সম্ভবত ‘বন্দনা’ থেকে এসেছে। মূলত এই পরবে বঙ্গাবুরু অর্থাৎ আরাধ্য দেবতাদের বন্দনার সাথে সাথে কৃষিকাজে সহযোগী পশু যেমন গোরু, মোষের বন্দনা করা হয়ে থাকে।

কথাসাহিত্যিক নলিনী বেরা তাঁর ‘তিরিয়ো আড়বাঁশি’ উপন্যাসে সহরায় পরবের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন-

“দাঁশায়ের মাস শেষ। শুরু হয়ে গেল সহরায় মাস। এসে গেল ‘হাতি লেকান সহরায়’।

তার মানে হাতির মতো সহরায়।

সবচেয়ে উঁচু। সবচেয়ে বড়।

পাঁচ-পাঁচটা দিনের পরব সহরায়। কালীপূজা বা অমাবস্যার দিন থেকে শুরু। কারোর কাছে 'পুস' বা পৌষ মাসও সহরায় মাস।"[৩]

সাঁওতালরা বাংলার কার্তিক মাসকে 'সহরায় চাঁদো' অর্থাৎ সহরায়ের মাস বলে থাকে। দাঁশায় মাস অর্থাৎ আশ্বিন মাসের সমাপ্তিতে সহরায় মাসের শুরু। কালীপুজোর পরেই সাঁওতালদের গ্রামে গ্রামে উদযাপিত হয় সহরায় পরব। তবে স্থান বিশেষে পৌষ মাসেও সহরায় পরব উদযাপিত হয়ে থাকে। সহরায় পরব যথেষ্ট খরচ সাপেক্ষ পরব। তাই বর্ধমান, বীরভূম, ঝাড়খণ্ডের কিছু অংশ সহ যে সকল স্থানে সাঁওতালদের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ, সেখানে পৌষ মাসের শুরুর দিকে ধান তোলা, ঝাড়াই ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করে, বাড়িতে খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করে গ্রামে সহরায় এর দিনক্ষণ স্থির করা হয়।

সহরায় পরব সাঁওতালদের মিলনোৎসব। এই পরবে বাড়ির বিবাহিত মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দাদা বা ভাই অথবা তার বাবা নিমন্ত্রণ করে আসে। কন্যা, ভগিনীদের পিতৃগৃহে আগমন, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের পুনর্মিলনের আনন্দে এক বিশাল মহোৎসবের রূপ নেয় সহরায় পরব। সহরায় পরব হয়ে ওঠে 'হাতি লেকান সহরায়'।

প্রথমেই গ্রামের মাঞ্জি বাবা অর্থাৎ গ্রাম প্রধান নিশ্চিত হন গ্রামের সবার বাড়িতে খাদ্যের জোগান হয়েছে কিনা। তারপর গডেৎ অর্থাৎ বার্তাবাহকের মাধ্যমে গ্রামে কুলহি দুড়ুপ অর্থাৎ সভা ডাকেন। সেখানে পরবের এই পাঁচটি দিনের দিনক্ষণ স্থির হয়। আর যেসব স্থানে কার্তিক মাসে সহরায় উদযাপিত হয় সেখানে শুরুর দিন তো নির্ধারিত থাকে কালীপুজোর দিন । এই পাঁচটি দিনের পাঁচটি বিশেষ নাম আছে। সেইসব দিনের কামিহরা অর্থাৎ কর্মসূচির উপর নির্ভর করেই দিনগুলির নামকরণ করা আছে। সহরায়ের প্রথম দিন 'উম মাহা', দ্বিতীয় দিন 'বঙ্গা মাহা', তৃতীয় দিন 'খুন্টোও মাহা', চতুর্থ দিন 'খুন্টোও তোৎ' এবং পঞ্চম দিন 'জালে মাহা'। আর পৌষ মাসের সহরায়ের শেষে 'সাকরাত' উদযাপন করা হয়। আর কার্তিক মাসে সহরায় উদযাপনকারী অঞ্চলে পৌষ মাসের শেষে যে সময় বাকিরা সাকরাত উদযাপন করে সেই সময় এরাও সাকরাত উদযাপন করে থাকে।

নলিনী বেরা তাঁর 'তিরিয়ো আড়বাঁশি' উপন্যাসে এর সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন-

"... কালীপূজার দিন 'উম'। তারপরের দিন 'বঁগায়'। তারপরের দিন 'খুনটাউ'। তারও পরের দিন 'খুনটা তোৎ'। আর শেষ দিন 'জালে'।

তার মানে প্রথম দিন- সিনান। তারপরের দিন পূজা। তৃতীয় দিন- গরু খুঁটা-কাড়া খুঁটা। চতুর্থ দিন- খুঁটা উপড়ানো। শেষদিন- ভাব-ভালবাসা ও নাচ।"[৪]

উম মাহায় গ্রামবাসীরা সকলে নদী,পুকুর বা নলকূপের জলে স্নান করবে। মহিলারা বাড়ির সমস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ নদী, পুকুর কেচে পরিষ্কার করবে। গডেৎ অর্থাৎ বার্তাবাহকের দ্বারা বাড়ি বাড়ি থেকে সংগৃহীত চাল, ডাল, আলু ও একটি করে মুরগি বা মুরগির বাচ্চা নিয়ে নায়কে বাবা অর্থাৎ পূজারীকে নিয়ে গ্রামবাসীরা চলে যায় গড় টান্ডি অর্থাৎ গোষ্ঠের মাঠে। সেখানে পূজার্চনা হয় এবং মারাংবুরু, জাহের আয়ো সহ সকল দেব-দেবীর জন্য একটি করে মুরগি উৎসর্গ করা হয়। গোরুদের নিয়ে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সিঁদুর লাগানো মুরগির ডিম মাটিতে রেখে গোরুদের গোরুদের তার উপরে ছুটানো হয়। যে গরু ডিম মাড়িয়ে ভেঙে এগিয়ে যাবে সেই গোরু এবং গোরুর মালিক জয়ী হবে। শুধুমাত্র জয়ী হওয়ায় নয়, তারা সৌভাগ্য অর্জন করেছে বলে সবাই বিশ্বাস করে। তারপর সংগৃহীত চাল, ডাল, আলু, মুরগির মাংস নিয়ে ভোগ খিচুড়ি (সোড়ে দাকা) রান্না হয়। বাচ্চাদের জন্য খিচুড়ি খাওয়া আর প্রাপ্তবয়স্ক যারা মদ্যপান করে তাদের জন্য হাড়িয়া মদ্যপানের মাধ্যমে সহরায়ের শুরু হয়। উম মাহার কার্যপ্রণালী শেষেই ধামসা মাদল বাজিয়ে সকলে গ্রামে ফিরে আসে। ধামসা মাজারের আওয়াজ আর তাল নিম্নরূপ-

"দাতাং দাতাং ধান্দিড় দাতাং
তিড়দাং হেতাং তিড়দাং
.....

উকুড় গুডডুম উকুড় গুডডুম
উকুড় গুডডুম উকুড় গুডডুম।"[৫]

নলিনী বেরা তাঁর 'তিরিয়ো আড়বাঁশি' উপন্যাসে নায়কে বাবাসহ গ্রামের পুরুষ মানুষদের উম মাহার কার্যপ্রণালী শেষে গ্রামে ফিরে আসা গানের উল্লেখ করেছেন-

"উখিন দিন দ সহরায় দ-
টাঁড়ি রেয়েম তাহেকান-
তিহিব্রত দ সহরায় দ-
তালা অড়াঃ ভিৎ আড়েরে-"[৬]

উপরোক্ত গানের কিছু শব্দের উচ্চারণগত ভুল অথবা লেখার সময় ভুলবশত বানানের ত্রুটি থাকলেও (উখিন>উন/উনোঃ, তিহিব্রত>তিহিঞ) গানের অর্থ ও এক বিশেষ অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। এই গানের অর্থ- এতদিন সহরায় ছিল গোষ্ঠের মাঠে, আজ সহরায় এল ঘরের ভেতরে। নায়কে বাবাকে বরণ করার মাধ্যমে দিনটি শেষ হয়। আর পরের দিনের আভাস দেওয়া হয় গানের মাধ্যমেই-

"তিহিঞ দলে উমকানা
দোল বাংলোর পুখরীর
ডাটা দলে বঙ্গায়..."[৭]

অর্থাৎ আজ দল বাদল পুকুরে উম বা স্নান করার পর আগামী দিনে বঙ্গা অর্থাৎ পূজার্চনা করা হবে।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'শালগিরার ডাকে' উপন্যাসের সহরায় পরবে একজন কন্যা-ভগিনীর কণ্ঠে তার অনুভূতির কথা গানের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন-

"বাহারেদ সহরায় রেদ
ইঞহঁ দাদা লাইক আঞপে,
ইঞহঁ দাদা আপে জাতি গে।
আপে রেয়াঃ দেওয়া সেবা
ইঞহঁ দাদা বাডায় গেয়া
ইঞহঁ দাদা আপে জাতি গে।"[৮]

অর্থাৎ বাহা পরবে বা সহরায় পরবে পরিবারের কন্যাকে যেন আমন্ত্রণ জানানো হয় কেননা সেও তাদেরই একজন। কীভাবে দেবদেবী ও গুরুজনের বন্দনা করা হয় বাদ দেবা সেবা করা হয় তারও জানা আছে কেননা সেও তাদেরই একজন। আর এই বিশেষ কারণে সহরায়ে আগত কন্যা ভগিনী রাও পূজার সামগ্রী নিয়ে আসে এবং তাদের নামে বাবা, দাদা বা ভাইয়েরা কূলদেবতার পূজো দিয়ে থাকে। এই বঙ্গাবুরুতে হাড়িয়া মদ উৎসর্গ করা হয়ে থাকে দেবতাদের উদ্দেশ্যে।।

বঙ্গা মাহার পরের দিন খুন্টাও মাহা। এই দিনটিতে মহিলারা সকাল সকাল ঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং নারী-পুরুষ সকলেই পাঞ্চি শাড়ি, পাঞ্চি ধুতি পরে নাচ গান করতে থাকে। বিকালে প্রতিটি পরিবার নিজের নিজের বাড়ির সদর দরজায় গরু-মোষ গুলোর পিঠে আলতা দিয়ে নকশা তৈরি, ধানের শিষ, গাঁদা ফুলের মালা, শিংয়ে তেল ও সিঁদুর মাখিয়ে, গলায় ঘন্টা ঝুলিয়ে সুন্দর সাজে সাজিয়ে বেঁধে রাখা হয়। আর তারপরেই শুরু হয় গ্রামবাসীর একত্রিত সাংস্কৃতিক নৃত্য।

চতুর্থ দিন জালে মাহায় গ্রামের কুলহিতে সারিবদ্ধ নৃত্য চলে। ধামসা-মাদল-বাঁশি হাতে পুরুষেরা এবং সারিবদ্ধভাবে হাতে হাত ধরে রমণীরা নাচতে থাকে। আর গৃহস্থে বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী খাদ্য, পিঠে ইত্যাদি খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন চলতে থাকে। এই দিনটি মূলত নাচ-,গান আর খাওয়া-দাওয়ার মাধ্যমে বিশেষ আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে। তবে দিনের শেষে সহরায়ের বিদায়ের সুরে ভগ্নহৃদয়ে মহিলারা গাইতে থাকে-

"আমেম তাঁহেকান সহরায় মঁজিঞ তাঁহেকান
আমেম চালাঃকান সহরায় বাড়িচ সানাঞ কান
আলো রাস্কৌম রা-গাসে আলো রাস্কৌম হম
বছর দিন আউরী তেগেঞ রুওয়ৌড় হিজুঃ আ।"[৯]

অর্থাৎ সহরায় যতক্ষণ থাকে আনন্দে মাতোয়ারা থাকে সাঁওতালরা। কিন্তু সহরায় চলে যাবার ফলে তাদের এই আনন্দের দিনটি আবার কঠোর পরিশ্রমের দিনে পরিবর্তিত হবে। তাই সহরায়ও যেন সাঁওতালদের শান্ত্বনা দেয় যে বছর ঘুরতে ঘুরতে সহরায় আবার ফিরবে। সহরায়ের শেষের দিনে সাকরাত সেঁদরা অর্থাৎ জঙ্গলে অন্বেষণে যায় সাঁওতাল পুরুষেরা। যদিও যে সমস্ত অঞ্চলে কার্তিক মাসে সহরায় হয় সেখানে পৌষ মাসের শেষের দিকে একটি নির্ধারিত দিনের সাকরাত সেঁদরা আয়োজিত হয়। কিন্তু যেখানে পৌষ মাসে সহরায় হয় সেখানে শেষ দিনে সাকরাত আয়োজিত হয়। পুরুষেরা জোটবদ্ধভাবে জঙ্গলে যায়। নানান ফলমূল, ভেষজ দ্রব্য সংগ্রহ করে এবং সাথে সাথে খাদ্যের জন্য প্রয়োজন মত পশু শিকার করে থাকে। তবে সেঁদরা অর্থাৎ অন্বেষণের মূলে আছে বনৌষধি ও ফলমূল সংগ্রহ করা।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'শালগিরার ডাকে' উপন্যাসে একটি গানে সেঁদরা প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন-

"সেনদ্রারে দ কারকারে দ
বলনরে সে নেওতাঞ পে,
ইঞহঁ দাদা আপে জাতি গে।"[১০]

অর্থাৎ সেই কন্যা বা ভগিনীর শ্বশুরবাড়ির দিকে অন্বেষণে গেলে যেন অবশ্যই তার বাড়িতে তারা ঘুরে আসে। কেননা সে তো সেই দাদারই ভগিনী। পরিবার, আত্মীয়স্বজনের প্রতি সাঁওতাল রমণীদের আত্মিক টান এখানে আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

সেঁদরা থেকে ফিরে গ্রামের সকলে গ্রাম প্রধান অর্থাৎ মাঞ্জি বাবার অধীন সমস্ত বনৌষধি, ফলমূল ও পশুপাখি জমা দেওয়া হয়। যা পরবর্তীতে সমানভাগে ভাগ করে প্রত্যেকটি পরিবারকে দেওয়া হয়। জমা পরবর্তী সময়ে সেঁদরায় যাওয়ার সকল পুরুষদের নিয়ে নায়কে বাবা ও গডেত বাবা কলা গাছে ভিজা তুঞ অর্থাৎ তীরন্দাজি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে এবং জয়ী ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করার মাধ্যমে 'হাতি লেকান সহরায়' পরবের শুভ সমাপ্তি ঘটে।

আসলে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী সহজ, সরল, সাধারণের পাশাপাশি কঠোর পরিশ্রমী হয়ে থাকে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে রাত্রিকালীন একটু আনন্দ করে ক্লান্তি দূর করা তাদের নিত্যদিনের অভ্যাস। এই আনন্দ নাচ(এনেজ), গান(সেরেঞ) বা ছড়া (অনড়হে), ধাঁধা (কুদুম) ইত্যাদির মাধ্যমে সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজনের সাথে হয়ে থাকে। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'শালগিরার ডাকে' উপন্যাসে বলেছেন সাঁওতালরা জীবনকে আনন্দ করে বাঁচার উৎসব মনে করে। তাই তারা সহরায়ের মতো বিভিন্ন রকম আনন্দ উৎসবে মত্ত হয়ে ওঠে। তাই মহাশ্বেতা দেবী এই উপন্যাসে সাঁওতালি গানের মাধ্যমে জীবনের এক চরম সত্যকে তুলে ধরেছেন-

"সওয়া ধারতিরে হাসা হড়মরে
লান্দায় লেকাগে জিউয়ি মেনাঃ।
নওয়া জিউয়ি দ শিশির দাঃ লেকা
অকা দিশম চং অটাং চালাঃ।"[১১]

সওয়া (নওয়া) ধারতিরে অর্থাৎ এই পৃথিবীতে মানব শরীর যেন মাটির তৈরী এবং সেই শরীরে মানব প্রাণের বাসা আছে। এই প্রাণ আর প্রাণের হাসি ভরা জীবন যেন প্রভাতের শিশিরের মতো কেউ জানে না কখন তা মিলিয়ে যাবে। কখন তা অনত্র বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে।

সাঁওতালি সংস্কৃতিতে সহরায়ের মাহাত্ম্য অন্যান্য পরবের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। সাঁওতালরা তাদের সংস্কৃতি নিয়ে গর্ববোধ করে। সহরায় তাদের বহমান ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অস্তিত্বের পরিচিতি। তবে কিছু ক্ষেত্রে সাঁওতাল সমাজের পঞ্চভদ্র ও বুদ্ধিজীবীদের সচেতন হওয়া উচিত। পরবে অতিরিক্ত মদ্যপান ও অনেক জায়গায় রাস্তায় রাস্তায় সহরায় নৃত্যের সময় যানবাহন আটকে চাঁদা তোলা বর্তমান শিক্ষিত সমাজে খুব একটা মানানসই নয়। সাঁওতাল সমাজ থেকে আগত বহু প্রতিনিধি আজ স্বদেশ হোক বা বিদেশে সর্বত্র সুনাম অর্জন করার মাধ্যমে সাঁওতাল সমাজকে যে মর্যাদা দানের চেষ্টা করছেন সেটাকে বজায় রাখা সাঁওতাল সমাজের প্রত্যেকের দায়িত্ব। এভাবেই পিছিয়ে পড়া সাঁওতাল সমাজও শিক্ষা ও উন্নতির মূলস্রোতে ফিরে আসবে তবে সেটা নিজের রীতিনীতি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ভুলে নয় ; সেগুলোকে গর্বের সাথে পালন করার মধ্য দিয়েই।

তথ্যসূত্র:

১) বেরা নলিনী, তিরিয়ো আড়বাঁশি, প্রতিক্ষণ, পৃঃ ৫৩ ।
২) বেরা নলিনী, তিরিয়ো আড়বাঁশি, প্রতিক্ষণ, পৃঃ ৭ ।
৩) বেরা নলিনী, তিরিয়ো আড়বাঁশি, প্রতিক্ষণ, পৃঃ ৫৩ ।
৪) বেরা নলিনী, তিরিয়ো আড়বাঁশি, প্রতিক্ষণ, পৃঃ ৫৩ ।
৫) দাস স্বপন কুমার (সম্পাদিত), আদিবাসী জগৎ ও স্বদেশ চর্চা, আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, পৃঃ ৭৫ ।
৬) বেরা নলিনী, তিরিয়ো আড়বাঁশি, প্রতিক্ষণ, পৃঃ ৫৫ ।
৭) দাস স্বপন কুমার (সম্পাদিত), আদিবাসী জগৎ ও স্বদেশ চর্চা, আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, পৃঃ ৭৫ ।
৮) দেবী মহাশ্বেতা, শালগিরার ডাকে, করুণা প্রকাশনী, পৃঃ ২৯ ।
৯) দাস স্বপন কুমার (সম্পাদিত), আদিবাসী জগৎ ও স্বদেশ চর্চা, আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, পৃঃ ৭৫ ।
১০) দেবী মহাশ্বেতা, শালগিরার ডাকে, করুণা প্রকাশনী, পৃঃ ৩০ ।
১১) দেবী মহাশ্বেতা, শালগিরার ডাকে, করুণা প্রকাশনী, পৃঃ ২৯ ।